যুগান্তর

MAY 17 2002

ড. আবদুল আজিজ খান

শিক্ষার মান উন্নয়ন অপরিহার্য

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। যে জাতি শিক্ষায় যত উন্নত সে জাতি সর্বদিক দিয়েই উন্নত। এটাই সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলে ব্রিটিশ আমলে এবং পাকিস্তান আমলেও শিক্ষার যে অবস্থা ছিল বাংলাদেশ সৃষ্টির পর তার অবনতি ঘটে। ক্রমান্বয়ে শিক্ষার অবনতি বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে বাংলাদেশের শিক্ষা দুর্দশাগ্রস্ত ও দুর্নীতিকবলিত। শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। ঢাকাতে এবং কতিপয় বড় শহরে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে। ধনীদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য বেসরকারি পর্যায়ে বিশেষ করে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার জন্য অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। এগুলো কিন্ডারগার্টেন নামে পরিচিত। এখানে ধনীদের ছেলেমেয়েরা স্বাচ্ছন্দ্যে লেখাপড়া করে। ঢাকা শহরে অনেক লোক আছেন যারা তাদের ছেলেমেয়েদের এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেয়ার আর্থিক অবস্থা না থাকলেও ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে কষ্টের মধ্যেও এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেন। নিম্নবিত্ত ও গরিব লোকরা তাদের ছেলেমেয়েদের সরকারি ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে পাঠান। এসব বিদ্যালয়ে অর্ধদিবস রেখে ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দেয়া হয়। এসব শিশু বাকি সময় অরক্ষিত অবস্থায় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করে। এ অবস্থাতে তাদের শিক্ষার ভিত্তিমূল শক্ত হয়ে গড়ে ওঠে না।

পল্লীতে প্রাইমারি শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হলেও এখনও অনেক ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যায় না। তাদের স্কুলে আসার জন্য আকর্ষণ ও ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন। পল্লীর শিশুদের লেখাপড়ার উৎসাহ প্রদানকল্পে যেসব ব্যবস্থা সরকারি অফিসার কর্তৃক চালু করা হয়েছে সেগুলো যথাযথভাবে প্রতিপালিত হলে সব শিশুই শিক্ষা অর্জন করতে পারত। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য প্রদান ব্যবস্থা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে সমস্যার সমাধান সহজ হতে পারে। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী ও অফিসারদের অবহেলার জন্য তা সম্ভব হচ্ছে না।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়া ব্যাধিগ্রস্ত– এর প্রধান কারণ শিক্ষকদের অমনোযোগ এবং আন্তরিকতার অভাব। স্কুল ও মাদ্রাসার ক্ষেত্রে অনেক সময় শোনা যায় ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাসে আসে না এবং সুযোগ পেলেই অনুপস্থিত থাকে। এর কারণ এদের মধ্যে জ্ঞান অন্বেষণের তাগিদ সৃষ্টি হয়নি। ফলে পরীক্ষার হলে সবাই নকল করে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ খোঁজে। এ অবস্থায় জ্ঞান অন্বেষণের তাগিদ, শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের কচি মনের ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ করার মতো তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ করার জন্য শিশুদের উপযোগী খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং বিদ্যালয় চত্বরে খোলা আকাশের নিচে দৌড়াদৌড়ি, ছোটাছুটি করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং শিক্ষকদেরও উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন। কিছুকাল আগেও এদেশের মাটিতে ফুটবল খেলার হিড়িক ছিল। প্রত্যেক মাধ্যমিক স্কুলের প্রায় ছেলেই ফুটবল খেলত অথবা মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দর্শন করত। পল্লীর গ্রামে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব যুবকই হা-ডু-ডু ও বদন (দাঁড়িয়াবান্ধা), বউচি, ওপেন্টিভ বাইস্কোপ, গোল্লাছুট এবং এ ধরনের অনেক খেলা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সমাজ থেকে এ খেলাগুলো লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয় চত্বরে হা-ডু-ডু, বদন, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল ইত্যাদি খেলার সুবিধা সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের ধরে রাখার জন্য লেখাপড়ার বাইরে আকর্ষণ সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। এর জন্য বর্তমান যুগের খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ করা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য বর্তমান যুগের ইনডোর খেলাধুলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন। এর জন্য কেরাম বোর্ড, বাগাডুলি, আরও অনেক ধরনের খেলা চালু করা উচিত। ফুটবল খেলা চালু করা এবং ভাল ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

ক্রীড়া শিক্ষক নামেমাত্র থাকলেও ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলায় কোন উদ্যোগ নেন না– এটা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। বিপিএডপ্রাপ্ত শিক্ষকরাও খেলাধুলা ভাল জানেন বলে মনে হয় না। সুতরাং খেলাধুলা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ক্রীড়া শিক্ষকসহ প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের, শিক্ষকদের এবং থানা ও জেলা পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তাদের আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা নেয়া প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, সমাজের সর্বস্তরে নিষ্ঠা ও সততা বিলুপ্তপ্রায়। এ অবস্থার পুনরুদ্ধারের জন্য সরকারের সততা ও আন্তরিকতা থাকতে হবে। খেলাধুলার সুচারু ব্যবস্থা হলে শিশুরা এবং অন্য ছাত্রছাত্রীরা নিজ থেকেই বিদ্যাপিঠে আসার জন্য ইচ্ছুক হবে। আগে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনালগ্নে খেলাধুলার মাঠের চিন্তাভাবনা ও ব্যবস্থা নিত। এমনকি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গেও একটা খোলা চত্বরের ব্যবস্থা থাকত।

স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরীক্ষায় নকল সর্বজনবিদিত। এটি বলা অত্যুক্তি হবে না শতকরা ৯০-৯৫ ভাগ ছাত্র নকলের চেষ্টায় থাকে। পরীক্ষার হলে শিক্ষক, পরিদর্শকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক এবং স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ নকল করার জন্য সুযোগ দেয়ায় সচেষ্ট থাকেন। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত সরকারি পরিদর্শক দল সামান্যই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। এই ব্যাধি দূর না করা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় মনোযোগ আসবে না। শিক্ষকবৃন্দ ইচ্ছা করলে নকল প্রবৃত্তি দূর করতে পারেন। এর জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। ছাত্র রাজনীতির দরুন ছাত্রনেতাদের এবং সার্বিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যে সাহসের উদ্রেক হয়েছে তা শুধু ছাত্র রাজনীতির সীমাবদ্ধতার মাধ্যমে দূর করা সম্ভব হবে। এখানে পুনরায় সরকার ও রাজনীতিবিদদের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে।

সর্বোপরি প্রয়োজন পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার। আমাদের দেশে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নির্দিষ্ট আকারে তৈরি করা হয়, যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা বই ও নোট বই থেকে লিখে নিয়ে পরীক্ষার হলে গিয়ে নকল করার সুযোগ পায়। এই ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি থাকলে নকল বন্ধ করা সুকঠিন হবে। আমাদের দেশে রচনা একটি প্রিয় প্রশ্ন এবং এ রচনাগুলো ২-৪টা বিষয়ের ওপর যথা ডিসিপ্লিন, নৌকা-ভ্রমণ, আমাদের স্কুল, বাংলাদেশের সোনালী অংশ এই ধরনের। এ ধরনের সেট প্রশ্ন না করে প্রশ্নগুলোর ধরন এমন হওয়া প্রয়োজন যে প্রশ্নের উত্তর শুধু নিজের অর্জিত জ্ঞান থেকে দেয়া সম্ভব যেমন কোন ছবি দিয়ে তার বিবরণ চাওয়া ইত্যাদি। এর জন্য স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের পরিশ্রম করে ছাত্রদের আত্মনির্ভরশীল এবং বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের ইচ্ছা থাকতে হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরও মেধা ভিত্তিতে নির্বাচন করা উচিত হবে যাতে তারা শিশুদের আত্মনির্ভরশীল এবং মৌলিক জ্ঞানসমৃদ্ধ করতে পারেন। এমনকি বিএ পর্যন্ত কোন ছাত্রছাত্রীদের ফেল করার পদ্ধতি উঠিয়ে দেয়া যায় কিনা তা বিবেচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বোর্ডে বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটের প্রাপ্ত নম্বর লিখিত থাকা প্রয়োজন হবে। এর ফলে কর্তৃপক্ষ স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হবেন এবং সর্বক্ষেত্রে চাকরির জন্য সুষ্ঠু নির্বাচন পদ্ধতি বাধ্যতামূলক থাকতে হবে এবং নিজেদের স্বার্থেই এটা চালু হবে। বস্তুত এদেশেও সর্বক্ষেত্রেই সরকারি পর্যায়ে অনেক ভাল ও উপকারী নিয়মনীতি আছে। কিন্তু দুর্দশা ও দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কমকর্তা, কর্মচারী ও সমাজের অর্ধশিক্ষিত, চতুর ও বেকার (স্থানীয়ভাবে এগুলোকে দালাল বা বখাটে/বাটপাড় বলা হয়) ব্যক্তিদের কারণে কোন ভাল নীতি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হয় না। যে কোন মাঠ পর্যায়রত নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীরা যাদের উপরে রেভিনিউ কালেকশন বা বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব থাকে তারা খুব সুচতুর এবং দুর্নীতিপরায়ণ হওয়ায় দেশের খুব ক্ষতি হচ্ছে এবং এদের যোগাযোগ উচ্চ পর্যায়ের কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে। কোন সৎ কর্মকর্তা এদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে গেলে কর্মচারীদের ইউনিয়ন এমন বাধা সৃষ্টি করে, কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত হয়ে বিদায় নিতে হয়। এসব ইউনিয়ন সবই রাজনৈতিক দল সমর্থিত, যার ফলে এদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয় না। সমাজের জবাবদিহিতা এক রকম উঠেই গিয়েছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের সার্বক্ষণিক চাকরি। কিন্তু তাদের ক্লাসের পরে স্কুলের ছাত্ররা কোন পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়ার জন্য গেলে তাদের অনেক সময় পাওয়া যায় না বললেই চলে (এ বিষয়ে কোন এক সময়ে বিশদ লেখার ইচ্ছা আছে)। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সুনীতির অভাবই আজ দেশের অকল্যাণ ও অধঃপতনের মূল কারণ।

ড. আবদুল আজিজ খান : *প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*